3452 - রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযিলত

প্রশ্ন

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর ফযিলত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার ফযিলত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন; তবে দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিতেন না। এরপর তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে রমযান মাসে কিয়াম করবে (রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন এবং এ বিষয়টি এভাবেই রয়ে গেল (অর্থাৎ তারাবী নামায জামাতে পড়া হত না)। আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালেও এভাবেই থাকল এবং উমর (রাঃ) এর খিলাফতের শুরুর দিকেও এভাবেই থাকল।

আমর বিন মুর্রা আল-জুহানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুযাআ’ গোত্রের এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কী অভিমত, আমি যদি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল (বার্তাবাহক), পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, একমাস রোযা রাখি, রমযান মাসে কিয়াম পালন করি এবং যাকাত প্রদান করি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে সে তো সিদ্দিকীন ও শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত (ঈমানদারদের সর্বোচ্চ দু’টি স্তর)।”।

লাইলাতুল ক্বদরকে নির্দিষ্টকরণ:

২। রমযান মাসের সর্বোত্তম রাত্রি হল- লাইলাতুল ক্বদর। দলিল হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদরে কিয়াম পালন করবে (ফলে তাকে তাওফিক দেয়া হবে) তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

৩। এ রাতটি হচ্ছে- অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ২৭ শে রমযানের রাত। অধিকাংশ হাদিস থেকে এ অভিমতটির পক্ষে সমর্থন পাওয়া

যায়। যেমন- যির্র বিন হুবাইশ (রাঃ) এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তাকে বলা হল: 'আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর কিয়ামুল লাইল পড়বে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবেই! তখন উবাই (রাঃ) বললেন: আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে মানুষ এক অভিমতের উপর নির্ভর করে বসে না থাকে। ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় লাইলাতুল ক্বদর রমযান মাসে। আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি এটি কোন রাত্রি। এটি সেই রাত্রি যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিয়াম পালন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সে রাতটি ছিল (রমযানের) ২৭ তম রজনী। আর সে রাত্রির আলামত হচ্ছে, সেদিন সকাল বেলা সূর্য শুভ্র হয়ে উদিত হবে; সূর্যের কোন আলোক রশ্মি থাকবে না।[কোন এক রেওয়ায়েতে এ বর্ণনাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'মারফু' হাদিস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস সংকলক এটি বর্ণনা করেছেন]

কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করার শরয়ি অনুমোদন:

৪। রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করা শরিয়ত সম্মত; বরং সেটা একাকী আদায় করার চেয়ে উত্তম। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামুল লাইল এর নামায জামাতের সাথে আদায় করার কারণে এবং তিনি জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল এর নামায আদায় করার ফযিলত বর্ণনা করার কারণে। যেমনটি আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযানের রোযা রাখলাম। তিনি গোটা মাস আমাদের নিয়ে কিয়ামুল লাইল পড়েননি। তবে, মাসের সাতদিন বাকী থাকতে (২৩ তম রজনীতে) তিনি আমাদের নিয়ে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ কিয়ামুল লাইল আদায় করলেন। যে রাত্রিতে মাসের আর ছয়দিন বাকী ছিল সে রাতে (২৪ তম রজনীতে) কিয়াম করেননি। মাসের আর পাঁচদিন বাকী থাকতে (২৫ তম রজনীতে) আবার অর্ধরাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আজকের গোটা রাতটা আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায পড়তেন। তখন তিনি বললেন: যদি কেউ ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামায পড়ে; তাহলে তার জন্য গোটা রাত কিয়াম পালন করার সওয়াব হিসাব করা হবে। এরপর যখন মাসের আর চারদিন বাকী ছিল সে রাতে তিনি কিয়াম করেননি। যখন আর তিনদিন বাকী ছিল সে রাতে (২৭ তম রজনীতে) তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকলকে জাগিয়ে দেন। সে রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেই থাকলেন পড়তেই থাকলেন। এক পর্যায়ে আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের 'ফালাহ্' ছুটে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'ফালাহ্' কী? তিনি বললেন: সেহেরী। এরপর তিনি মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আর কিয়ামুল লাইল পালন করেননি।"[হাদিসটি সহিহ; সুনান গ্রন্থাকারগণ হাদিসটি সংকলন করেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতের সাথে 'কিয়ামুল লাইল' পালন করা অব্যাহত না রাখার কারণ:

৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসের অবশিষ্টাংশ জামাতের সাথে কিয়ামুল পালন না করার কারণ হচ্ছে, এই আশংকা যে, না-জানি রমযান মাসে কিয়ামুল লাইল পালন করা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। তখন তারা সেটা পালন করতে

সক্ষম হবে না। যেমনটি এসেছে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক ইসলামী শরিয়তকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এ আশংকাটি দূর হয়ে গেছে। অতএব, আশংকার কারণে গৃহীত পদক্ষেপে তথা কিয়ামুল লাইলে জামাত বর্জন করাও দূরীভূত হয়ে গেলে এবং পূর্বের হুকুম বহাল থাকল; সেটো হচ্ছে জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার অনুমোদন। এ কারণে উমর (রাঃ) এ বিধানটিকে পূর্ণজীবিত করেছেন; যেমনটি সহিহ বুখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনাতে এসেছে।

মহিলাদের জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল পালনের অনুমোদন:

৬। যেমনটি পূর্বোক্ত আবু যার (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, মহিলাদের জন্য জামাতে হাযির হওয়া শরিয়তসম্মত। বরং মহিলাদের জন্য পুরুষদের ইমামের পরিবর্তে আলাদা ইমাম নির্ধারণ করাও জায়েয। কেননা, উমর (রাঃ) যখন জামাতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করলেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই বিন কা’ব (রাঃ) কে এবং মহিলাদের জন্য সুলাইমান বিন আবু হাছমা (রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করলেন। আরফাজা আল-ছাকাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) রমযান মাসে লোকদেরকে কিয়ামুল লাইল আদায় করার নির্দেশ দিতেন। তিনি পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মহিলাদের জন্য অন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। তিনি বলেন: আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম।”

আমি বলব: এটা সেক্ষেত্রে হতে পারে যদি মসজিদ প্রশস্ত হয় এবং ইমামদ্বয়ের একজনের পড়া অপর জনের অসুবিধা না-করে সেক্ষেত্রে।

কিয়ামুল লাইল এর রাকাত সংখ্যা:

৭। কিয়ামুল লাইল এর নামায ১১ রাকাত। এক্ষেত্রে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে এর চেয়ে বেশি রাকাত না বাড়ানো। কেননা তিনি মৃত্যু অবধি কিয়ামুল লাইল নামাযের রাকাত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বাড়াননি। আয়েশা (রাঃ) কে রমযান মাসে তাঁর কিয়ামুল লাইল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবেন না! এরপর আরও চার রাকাত নামায পড়তেন এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করবেন না। এরপর তিন রাকাত নামায পড়তেন।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

৮। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর চেয়ে কম সংখ্যক বিতিরের নামায পড়তে পারেন। এমনকি এক রাকাত বিতিরও পড়তে পারেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম ও কথার দলিলের ভিত্তিতে।

কর্মের দলিল: আয়েশা (রাঃ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়

রাকাত বিতির নামায পড়তেন? তিনি বলেন: চার রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। ছয় রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। দশ রাকাত পড়ে তিন রাকাত বিতির পড়তেন। তিনি সাত রাকাতের চেয়ে কম কিংবা তের রাকাতের বেশি বিতির নামায আদায় করেননি।[সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ]

আর তাঁর কথার দলিল হচ্ছে: “বিতির সত্য। কেউ চাইলে সে পাঁচ রাকাত বিতির পড়তে পারে। কেউ তিন রাকাত পড়তে পারে। কেউ এক রাকাত বিতির পড়তে পারে।”।

কিয়ামুল লাইল এর নামাযে কুরআন তেলাওয়াত:

রমযানে কিংবা অন্য সময়ে কিয়ামুল লাইলে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করেননি যে, সে সীমার চেয়ে বাড়ানো বা কমানো যাবে না। বরং নামাযের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ক্বেরাতও দীর্ঘ কিংবা সংক্ষিপ্ত হত। তিনি কখনও এক রাকাত নামাযে يا أيها المزمل (ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যামিল) পড়তেন। এ সূরাটির আয়াত সংখ্যা ২০। কখনও ৫০ আয়াত পড়তেন। তিনি বলতেন: “যে ব্যক্তি এক রাতে ১০০ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে গাফেলদের মধ্যে লেখা হবে না।”। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি দুইশ আয়াত দিয়ে কিয়াম পালন করবে তাকে ‘ক্বানিতীন মুখলিসীন’ দের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত শরীরেও এক রাতে সাতটি লম্বা সূরা পড়েছেন। সে সূরাগুলো হচ্ছে, সূরা বাক্বারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আনআম, সূরা আরাফ ও সূরা তাওবা।

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ার ঘটনায় এসেছে যে, তিনি এক রাকাতে সূরা বাক্বারা, এরপর সূরা নিসা, এরপর সূরা আলে-ইমরান ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করেছেন।

সহিহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমর (রাঃ) যখন রমযান মাসে উবাই বিন কাব (রাঃ) কে লোকদের ইমাম হয়ে ১১ রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন তখন উবাই (রাঃ) একশত আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো দিয়ে তেলাওয়াত করতেন। তাঁর পেছনে যারা নামায পড়ত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে তাদেরকে লাঠির ওপর ভর করতে হত। তারা ফজরের কাছাকাছি সময়ে নামায শেষ করতেন।

উমর (রাঃ) থেকে সহিহ সনদে আরও এসেছে যে, তিনি রমযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকালেন। যে ক্বারী দ্রুত তেলাওয়াত করেন তিনি তাকে ৩০ আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন। যে ক্বারী মধ্যম গতিতে তেলাওয়াত করেন তাকে ২৫ আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন। আর যে ক্বারী ধীরে তেলাওয়াত করেন তাকে ২০ আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, যে ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে সে যতটুকু ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, মুক্তাদিরা যদি একমত থাকে সে ক্ষেত্রেও। যত দীর্ঘ করা যায় তত উত্তম। তবে এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে। তাই এত লম্বা করবে না যে, গোটা রাত নামাযে কাটিয়ে দিবে; খুব বিরল ক্ষেত্রে ছাড়া। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদের আদর্শ।” আর যদি ইমাম হিসেবে নামায আদায় করেন তাহলে তিনি এ পরিমাণ দীর্ঘ করতে পারেন যাতে করে পেছনে যারা আছে তাদের জন্য কষ্টকর না হয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন অন্যদের নিয়ে নামায আদায় করে তখন সে যেন হালকাভাবে নামায পড়ে। কেননা মুসল্লিদের মধ্যে অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। আর যদি কেউ একাকী নামায পড়ে তখন যতক্ষণ খুশি নামায দীর্ঘ করতে পারে।”।

কিয়ামুল লাইল এর সময়কাল:

১০। কিয়ামুল লাইল এর সময় এশার নামাযের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি নামায দিয়েছেন, সে নামাযটি হচ্ছে বিতিরের নামায। তোমরা এশার নামায ও ফজরের নামায মাঝখানে সে নামাযটি আদায় কর।”

১১। যার পক্ষে সম্ভব তার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে নামায আদায় করা উত্তম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না তবে সে যেন প্রথম রাত্রিতে বিতিরের নামায আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠার আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন শেষ রাতে বিতিরের নামায আদায় করে। কারণ শেষ রাতের নামাযে (ফেরেশতারা) হাযির থাকে। তাই সেটি উত্তম।”

১২। যদি ব্যাপারটি এ রকম হয় যে, প্রথম রাতে নামায পড়লে জামাতের সাথে পড়া যাবে। আর শেষ রাতে পড়লে একাকী পড়তে হবে; সেক্ষেত্রে জামাতের সাথে নামায পড়াই উত্তম। কেননা জামাতের সাথে পড়লে সেটাকে সমস্ত রাত নামায পড়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

উমর (রাঃ) এর যামানায় এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের আমল। আব্দুর রহমান বিন উবাইদ আল-ক্বারী বলেন: একবার রমযানের একরাত্রিতে আমি উমর (রাঃ) এর সঙ্গে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। এসে দেখলাম লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছে। কেউ একাকী নামায পড়ছে। কারো পেছনে একদল লোক নামায পড়ছে। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ্র শপথ, আমি মনে করি আমি যদি এদের সবাইকে একজন ক্বারীর পেছনে একত্রিত করি সেটা উত্তম। এরপর তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সবাইকে উবাই বিন কা’ব (রাঃ) এর পেছনে একত্রিত করলেন। তিনি বলেন: এরপর অন্য এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হলাম; গিয়ে দেখলাম লোকেরা তাদের ক্বারীর পেছনে নামায পড়ছে। তখন উমর (রাঃ) বলেন: এটি কতই না ভাল বিদাত! তারা যে সময়টায় ঘুমিয়ে থাকে সে সময়টা যে সময়টা নামায পড়ে সে সময়ের চেয়ে উত্তম (তিনি শেষ রাতের কথা বুঝাতে চেয়েছেন)। লোকেরা প্রথম রাত্রিতে নামায পড়তেন।”।

যায়েদ বিন ওয়াহব বলেন: “রমযান মাসে আব্দুল্লাহ্ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন এবং অনেক রাতে নামায শেষ করতেন।”

১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যখন তিন রাকাত বিতিরের নামায পড়তে নিষেধ করেন এবং এ নিষেধাজ্ঞার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন: "যেন তোমরা মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য না কর" সে জন্য মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য থেকে বের হওয়ার দুইটি পদ্ধতি হতে পারে:

ক. জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে ফেলা (অর্থাৎ দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলা)। এই অভিমতটি অধিক শক্তিশালী ও উত্তম।

খ. জোড় ও বেজোড় রাকাতের মাঝখানে না বসা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বিতিরের তিন রাকাত নামাযে ক্বেরাত পড়ার পদ্ধতি:

১৪। তিন রাকাত বিশিষ্ট বিতিরের নামাযের প্রথম রাকাতে سبح اسم ربك الأعلى (সূরা আ'লা) পড়া সুন্নত। দ্বিতীয় রাকাতে قل يا أيها الكافرون (সূরা কাফিরুন) পড়া সুন্নত। তৃতীয় রাকাতে قل هو الله أحد (সূরা ইখলাস) পড়া সুন্নত। কখনও কখনও এর সাথে قل أعوذ برب الفلق (সূরা ফালাক্ব) ও قل أعوذ برب الناس(সূরা নাস) মিলাবে।

সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের এক রাকাত নামাযে সূরা নিসার ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

দোয়ায়ে কুনুত:

১৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহিত্র হাসান বিন আলী (রাঃ) কে যে দোয়াটি শিখিয়েছেন সে দোয়াটি দিয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়া। সে দোয়াটি হচ্ছে, (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك إلا إليك) অর্থ- "হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন তাদের সাথে আমাকেও হেদায়েত দিন। আপনি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও নিরাপদে রাখুন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন (প্রবৃদ্ধি দিন)। আপনি যে অমঙ্গল নির্ধারণ করে রেখেছেন তা হতে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা, আপনিই ভাগ্যের সিদ্ধান্ত দেন; আপনার ওপরে সিদ্ধান্ত দেয়ার কেউ নেই। আপনি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন সে কোনদিন লাঞ্ছিত হবে না। আর আপনি যার সাথে শত্রুতা করেন সে কোনদিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! আপনি বরকতপূর্ণ ও সুমহান। আপনার থেকে মুক্তির উপায় আপনার কাছে ফিরে আসা।"

মাঝে মাঝে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ পড়বে; সামনে যে দলিল উল্লেখ করা হবে তার ভিত্তিতে।

উল্লেখিত দোয়ার সাথে শরিয়ত অনুমোদিত অন্য যে কোন দোয়া, সঠিক ও ভাল অর্থবোধক দোয়া যুক্ত করতে কোন বাধা নেই।

১৬। যে ব্যক্তি রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়েন তাতে কোন অসুবিধা নেই।

উল্লেখিত দোয়ায়ে কুনুতের উপর বাড়তি দোয়া যেমন, রমযানের দ্বিতীয় অর্ধাংশে কাফেরদের ওপর লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া ও মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা উমর (রাঃ) এর সময়কালের ইমামদের আমল থেকে এগুলো সাব্যস্ত আছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত আব্দুর রহমান বিন উবাইদ আল-ক্বারী এর হাদিসের শেষাংশে এসেছে, “তারা শেষে অর্ধাংশে কাফেরদের উপর লানত করে বলতেন: হে আল্লাহ্! আপনি সেসব কাফেরদের উপর লানত করুন; যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছে, আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, আপনার প্রতিশ্রুতির প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তাদের একতাকে ভেঙ্গে দিন। তাদের অন্তরগুলোতে ভীতি ঢুকিয়ে দিন। তাদের উপর আপনার আযাব-গজব নাযিল করুন। ওগো, সত্য উপাস্য!। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়বে। সাধ্যানুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করবে।

তিনি বলেন: তিনি যখন কাফেরদেরকে লানত করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়া, মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ করতেন তখন বলতেন:
اللهمإياكنعبد،ولكنصليونسجد،وإليكنسعىونحفد،ونرجورحمتكربنا،ونخافعذابكالجد،إنعذابكلمنعاديتملحق (অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি। আপনার জন্যই নামায পড়ি। আপনাকেই সিজদা করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই। আপনারই আনুগত্য করি। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার করুণা প্রত্যাশা করি এবং আপনার সুনিশ্চিত শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি আপনার শত্রুদেরকে বেষ্টন করবেই।”এরপর তাকবীর দিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে।

বিতির নামাযের শেষাংশে কী বলবে:

১৭। বিতিরের নামাযের শেষ দিকে (সালাম ফিরানোর আগে কিংবা পরে) যা বলা সুন্নত:

اللهمإنيأعوذبرضاكمنسخطك،وبمعافاتكمنعقوبتك،وأعوذبكمنك،لاأحصيثناءعليك،أنتكماأثنيتعلىنفسك (অর্থ- “হে আল্লাহ! আমি আপনার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে। আপনার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই আপনার ক্ষমার মাধ্যমে। আপনার থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় চাই। আপনার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না। আপনি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা আপনি নিজে যেভাবে করেছেন।”।

১৮। যখন বিতিরের নামাযের সালাম ফিরাবে তখন বলবে: سبحانالملكالقدوس،سبحانالملكالقدوس (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। অর্থ- ‘কতই না পবিত্র ও মহান

বাদশাহ’) টেনে টেনে তিনবার বলবে এবং তৃতীয়বারে উচ্চস্বরে বলবে।

বিতিরের পর দুই রাকাত নামায পড়া:

১৯। যদি কেউ ইচ্ছা করেন তাহলে বিতিরের পর দুই রাকাত নামায পড়তে পারেন। যেহেতু এই আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। বরং তিনি বলেছেন: “নিশ্চয় এই সফর কষ্টকর ও কঠিন। অতএব, তোমাদের কেউ বিতিরের নামায পড়ার পর যেন দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। যদি সে জাগতে পারে ভাল; আর না পারলে এই দুই রাকাত তার জন্য যথেষ্ট।”

২০। এই দুই রাকাত নামাযে إذا زلزلت الأرض (সূরা যিলযাল) ও قل يا أيها الكافرون (সূরা ক্বাফিরুন) পড়া সুন্নাহ।